ইতিহাসের অপবাদ
অপবাদের ইতিহাস

ড. ইউসুফ আল কারজাভি

ভাষান্তর

সাইফুল ইসলাম তাওহিদ || ওয়াহিদ আমিম

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

ইসলামের ইতিহাস নিয়ে প্রাচ্যবিদদের মিথ্যাচার ও বিকৃতি

শরিয়াহর বাস্তবায়ন শুধু উমর (রা.)-এর আমলেই হয়েছিল ২৩

ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের দাবির প্রেক্ষাপট ২৩

অপবাদের জবাব ২৫

শরিয়াহই ছিল ইসলামি সমাজের মূল চালিকাশক্তি ৩৫

শরিয়াহর সামনে হাজ্জাজও মাথা নত করেছিল ৪০

জনগণের ওপর শাসকদের প্রভাব ৪১

ইতিহাস বিকৃতির কিছু উদাহরণ ৪৩

উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) সম্পর্কে অপবাদ ৪৫

যুক্তি, ইজমা ও ইতিহাসের বিচারে যে দাবি মিথ্যা প্রমাণিত ৪৬

যে দাবিকে ইজমা প্রত্যাখ্যান করে ৪৭

ইতিহাস যে দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করে ৪৭

হিমস শহরে দুর্গ নির্মাণ ৫০

মানুষের মাঝে উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)-এর রাজনীতির প্রভাব ৫৫

হাজ্জাজ সম্পর্কে সেক্যুলারপন্থি লেখকের অবস্থান ৫৮

ইসলামি ইতিহাসের ওপর কিছু দাঈ-গবেষকের কঠোরতা ৬১

ওস্তাদ মওদূদী (রহ.)-এর বাড়াবাড়ি ৬৩

জাহেলিয়াতের আক্রমণ ৬৪

ব্যাপকতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ৬৭

ওস্তাদ মওদূদী (রহ.)-এর আত্মস্বীকৃতি ৭০

ইসলামি সভ্যতার কঠোর সমালোচনা ৭০

ওস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুবের বক্তব্য ৭৩

শাইখ গাজালির বক্তব্য ৭৮

ইসলামের ইতিহাস নিয়ে সমালোচক স্কলারদের স্বীকারোক্তি ৮৩
ইসলামি রাজতন্ত্রের যুগে সৎ শাসকদের আধিক্য ৯১

উমাইয়া ও আব্বাসি খিলাফত সম্পর্কে ইসলামি শরিয়াহর অবস্থান

উমাইয়া খিলাফত ৯৭
একটি অপবাদ : দ্বীনি বাস্তবতার আলোকে তা মিথ্যা প্রমাণ ৯৭
ইতিহাসের বাস্তবতা যে অপবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করে ১০০
বনু উমাইয়া রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবনী ১০৬
খলিফা ও শাসক হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.) ১১০
উমাইয়াদের ওপর ইতিহাসবিদদের অবিচার ১২০
উমাইয়াদের ওপর আধুনিক লেখক বা স্কলারদের ক্রোধ ১২২
ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ ও ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালিদ ১২৭

আব্বাসি খিলাফত ১৩১
জ্ঞান ও সভ্যতায় সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ১৩৩
মুসলমানদের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে ড. নাশশারের গবেষণা ১৩৯
আরবদের শিক্ষা-সিলেবাস সম্পর্কে গুস্তাভ লে বোন-এর সাক্ষ্য ১৪৪
শিল্প ও ফলিতবিজ্ঞান ১৪৭
চিকিৎসাবিজ্ঞান ১৪৮
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে আমাদের ঐতিহ্য ও রচনাসম্ভার ১৪৮
বিশ্ব সভ্যতার গ্রন্থাগারে মুসলিম রচনাসম্ভার ১৫০

ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরব

ইতিহাসের কৃতিত্ব ১৫৯
গভীর ধার্মিকতার ছোঁয়া ১৬০
আমাদের সভ্যতায় দ্বীনের প্রভাব ১৬৪
দ্বীন ও ইলমের আলিঙ্গন ১৬৬
বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনাভিত্তিক জ্ঞানের মাঝে সমন্বয় ১৬৮

মানবতা ও মনুষ্যত্ব ১৭১
বির ও খাইর-এর প্রকৃত অর্থ ১৭৬
ইসলামি ইতিহাসে বির ও খাইরের প্রভাব ১৭৭
মুসলমানদের ইতিহাসে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ১৮০

চারিত্রিক উৎকর্ষতা ১৮৪

অবরোধকারীদের ব্যাপারে উসমান (রা.)-এর অবস্থান ১৯১
ইবনে মুলজিম কর্তৃক প্রহৃত হওয়ার পর আলি (রা.)-এর ওসিয়ত ১৯৩
দয়ালু স্বভাব ১৯৪
অসুস্থদের সাথে দয়ার আচরণ ১৯৮
জনকল্যাণমূলক হাসপাতাল ১৯৮
আদাদি হাসপাতাল বাগদাদ ২০২
নুরি হাসপাতাল দামেশক ২০৩
মানসুরি হাসপাতাল ২০৪
মারাকিশ হাসপাতাল ২১০
পশু-পাখির সাথে দয়া ২৩৩
গুস্তাভ লে বোনের সাক্ষ্য ২২৩

ধর্মীয় উদারতা ২২৫

উদারতার ভিত আল কুরআন ২২৫
নবিজীবনীতে ধর্মীয় উদারতা ২২৯
অমুসলিমদের সাথে সাহাবিদের উদারতা ২৩১
ইমাম ও ফকিহদের উদারতা ২৩২
মধ্যপন্থি পশ্চিমা ইতিহাসবিদদের স্বীকারোক্তি ২৩৫
উমাইয়া যুগে উদারতা ২৩৬
আব্বাসি আমলে উদারতা ২৩৭
আমাদের সভ্যতার কীর্তি ২৪১
ইসলাম বিস্তৃত হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে ২৪৪
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বকীয়তার মাধ্যমেই হয়েছে ইসলামের বিস্তার ২৪৭
ইসলাম শান্তির ধর্ম ২৫০

গুস্তাভ লে বোনের সাক্ষ্য ২৫৩
টমাস আর্নল্ডের ভাষ্য ২৫৮
বড়ো পরীক্ষার মোকাবিলা করার সক্ষমতা ২৫৯
রিদ্দা ২৬০
সবচেয়ে বড়ো দুর্যোগ সাহাবিদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ২৬১
ইউরোপীয়দের সাথে ক্রুসেড যুদ্ধ ২৬৩
তাতারি দুর্যোগ ২৬৬
বাগদাদ পতনের দুই বছরের মধ্যেই ইসলামের বিজয় ২৭০
তাতারদের ইসলাম গ্রহণ ২৭১
ইসলামের এক জায়গায় অস্তাগমন মানেই অন্যত্র তার উদয় ২৭৩

ইসলামের ইতিহাস বিকৃতির দায়ভার কার ২৭৬

মুসলিম ইতিহাসবিদদের দায়ভার ২৭৬
ইতিহাস সংকলন ২৭৭
ইতিহাসবিদদের নিয়ে ইবনে খালদুনের সমালোচনা ২৮৫
সংস্কারের ইতিহাস ইসলামের সাথেই সংযুক্ত ৩০১
ইতিহাস রচনা পদ্ধতির গলদ ৩০২
বর্জিত ইতিহাসের উৎস ৩০৩
সাহিত্যিকদের দায়ভার ৩০৪
মুহাদ্দিসদের দায়ভার ৩১৪
ফিতনার হাদিস ৩১৭
উম্মতের ৭৩ দলে বিভক্ত হওয়া ৩১৯

ইসলামের ইতিহাস লেখার পুনরাবৃত্তি ৩২৫

ইসলামের ইতিহাস পুনরাবৃত্তির কারণ ৩২৫
পরাশক্তিদের ইচ্ছানুযায়ী রচিত ইতিহাস ৩২৬
ইসলামের ইতিহাস কারা লিখবে ৩২৭
যে দুই আপদ থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি ৩২৭
ইতিহাসের শত্রু ৩৩২
ইতিহাস লেখার নতুন প্রতিষ্ঠান ৩৩২

ইতিহাস শুদ্ধিকরণে বাড়াবাড়ি	৩৩৪
ড. আবিসের বনি উমাইয়ার পক্ষালম্বন	৩৩৭
মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিজ ছেলে ইয়াজিদের পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ	৩৩৯
ইয়াজিদের বাইয়াতের পক্ষে সমর্থন	৩৪১
ইসলামের ইতিহাস নিয়ে মুহাম্মাদ কুতুবের মধ্যপন্থা অবলম্বন	৩৪৬
প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত আরব ইতিহাসবিদদের অবস্থান	৩৪৯
বিশ্বস্ততার সাথে বিকৃতির পদক্ষেপসমূহ অধ্যয়ন	৩৫০
উমাইয়া যুগে ইতিহাস বিকৃতির পরিমাণ	৩৫১
মুহাম্মাদ কুতুবের ইনসাফপূর্ণ বক্তব্য	৩৫২
আব্বাসি ও উসমানি আমলে বিচ্যুতি	৩৫৭
কালো চশমা খুলে ফেলার প্রয়োজনীয়তা	৩৬৩
সামসময়িক উপকরণ থেকে ফায়দা হাসিল	৩৬৬
ইতিহাসের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি	৩৬৭

শরিয়াহর বাস্তবায়ন শুধু উমর (রা.)-এর আমলেই হয়েছিল

(একটি অপবাদ ও তার খণ্ডন)

ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের দাবির প্রেক্ষাপট

বর্তমান যুগে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা একটি মিথ্যা অপবাদকে খুব জোরালোভাবে প্রচার করছে। যে অপবাদটি নিজেই নিজের অসারতার প্রমাণ। আর তা হলো—'শুধু খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ইসলামি শরিয়াহর পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছিল।' অনেকে আবার আরেকটু বাড়িয়ে বলে—'দীর্ঘ গবেষণা ও পর্যালোচনার পর এটা প্রতীয়মান হয়, ইসলামি শরিয়াহ শুধু উমর (রা.)-এর যুগেই পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছিল। তাঁর আগে ও পরে অন্য কোনো যুগে তা পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি; যেটুকু হয়েছিল, তা ছিল আংশিক বাস্তবায়ন।

সুতরাং হে মুসলমানরা! তোমরা আমাদের এমন শরিয়াহ গ্রহণের দাওয়াত দিয়ো না, যা বাস্তবায়ন করতে অন্যান্য ইসলামি যুগ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আর অতীত ইতিহাস যা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে, বর্তমানে তা কতটুকু বাস্তবায়ন সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়।'

তারা আরও বলে—'ইসলামি শরিয়াহ একটি কল্পনাপ্রসূত চিন্তাধারা। জীবনের বাস্তবতা মোকাবিলা করা তার পক্ষে অসম্ভব। ইতিহাস এর সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী।'

যে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা আমাদের কর্ণকুহরে এসব অসার বুলি বারবার আওড়ায়, এসব কথা মূলত তাদের নয়। তাদের চিন্তার ফল ও ফসলও নয়। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে এ নিয়ে প্রথম কথা বলেন প্রখ্যাত লেখক ও আরবি সাহিত্যিক ওস্তাদ খালেদ মুহাম্মাদ খালেদ। তিনি তাঁর রচিত *মিন হুনা নবদাউ* গ্রন্থে সর্বপ্রথম এ নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর এই আলোচনা পাঠক, লেখক ও গবেষকমহলে সমালোচনার ঝড় তোলে এবং উদ্রেক করে বিভিন্ন সন্দেহের।

লেখকের অজান্তেই গ্রন্থটি সেক্যুলারমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এটি বড়ো উপকারে আসে তাদের। নিজেদের বিষাক্ত কথাগুলো ছাড়ানোর অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে তারা এই গ্রন্থটিকে। এখন প্রশ্ন হলো—আসলে খালেদ মুহাম্মাদ খালেদ কী বলেছেন? তিনি বলেছেন—

> 'তোমরা খোলাফায়ে রাশেদার যুগ বলো না। কারণ, আবু বকর (রা.)-এর যুগ ছিল মাত্র দুই বছর। রিদ্দার যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়েই এ দুই বছর কেটে যায়। উসমান (রা.)-এর যুগ ছিল ফিতনা ও বিদ্রোহের যুগ। তাঁকে শহিদ করার মাধ্যমে এ যুগের অবসান ঘটে।

> আলি (রা.)-এর যুগ ছিল গৃহযুদ্ধের যুগ। সুতরাং এই সমীকরণ থেকে বলা যায়, শুধু উমর (রা.)-এর যুগ ছিল অন্যদের থেকে আলাদা। উমর (রা.) ছিলেন যুগের বিস্ময়কর এক ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিত্বের নজির ইতিহাসে বারবার আসে না। আর পরবর্তী সবগুলো যুগই ছিল ইসলামি শরিয়াহ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে অনেকটা দূরে।'

এ ধরনের কিছু কথা ওস্তাদ মুহাম্মাদ খালেদ বলেছেন। গোটা দুনিয়ার ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা তাঁর থেকেই এসব কথা নকল করেছে।[১] যদিও তারা এগুলো বলার সময় তাঁর রেফারেন্স উল্লেখ করে না; বরং তা নিজেদের আবিষ্কৃত মতামত বলে চালিয়ে দেয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, ওস্তাদ খালেদ কিন্তু তাঁর বক্তব্য থেকে ফিরে এসেছেন; এমনকি তাঁর ফিরে আসার কথা ঘোষণাও দিয়েছেন জনসম্মুখে। ইতঃপূর্বে প্রদত্ত সেক্যুলারিজমের গন্ধে দূষিত বক্তব্য যে ভুল ছিল[২], তা স্বীকার করে তিনি *আদ্দাওলাতু ফিল ইসলাম* নামে রচনা করেছেন একটি গ্রন্থও। তাতে তিনি প্রমাণ করেছেন, ইসলাম একটি দ্বীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। রাষ্ট্রের জন্য ইসলামের প্রয়োজনীয়তাও তাতে তুলে ধরেছেন। আর এ গ্রন্থ লেখার প্রেক্ষাপটও তুলে ধরেছেন বইটির ভূমিকায়।

ক্ষমাপ্রার্থনা ও ভুল স্বীকারের এই গুণটি কিন্তু সত্যিই বিরল, যা সহজে সবার মধ্যে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তায়ালা শাইখ খালেদ মুহাম্মাদ খালেদকে ক্ষমা করুন এবং দুনিয়া-আখিরাতে তাঁকে দান করুন উত্তম প্রতিদান।

অপবাদের জবাব

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা এই অপবাদ ও অপপ্রচারের মাধ্যমে আমাদের ইতিহাসের প্রতি জুলুম করেছে। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের প্রতি ছুড়ে দিয়েছে কলঙ্কের দাগ। প্রশ্নবিদ্ধ করেছে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে—যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গোটা পৃথিবীকে আলোর পথ দেখিয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি, তাদের এই অপবাদ ও অপপ্রচারের জবাব দিতে। চেষ্টা করেছি ইসলামি শরিয়াহ ও ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঠিক রূপ তুলে ধরতে। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, দাওয়াত, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নগরায়ণ ও জিহাদের ময়দানে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের অবদান বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরেছি। একই সাথে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অসারতা, তাদের অপপ্রচার ও ভুলগুলো উপস্থাপন করেছি বিশ্ববাসীর সামনে।

তাদের এই অপপ্রচারের পেছনে রয়েছে বেশ কিছু ভ্রান্ত যুক্তি। তার মধ্যে প্রধানতম তিনটি ভ্রান্ত যুক্তি উল্লেখ করে আমরা তা খণ্ডন করব—

১. খোলাফায়ে রাশেদার যুগকে উমর (রা.)-এর যুগের সাথে সীমাবদ্ধ করা : ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা খোলাফায়ে রাশেদার যুগ বলতে শুধু উমর (রা.)-এর যুগকে বুঝিয়ে থাকে। তারা প্রথম খলিফা

---

[১] যেমন : ফুয়াদ জাকারিয়া তার *আনিস সাহওয়া* গ্রন্থে এসব কথা উল্লেখ করেছে। এসব কথার উত্তর আমি আমার *আল-ইসলাম ওয়াল আল মানিয়্যাহ* গ্রন্থে দিয়েছি।

[২] তাঁর কথার জবাব দিয়েছেন তার বন্ধু শাইখ মুহাম্মাদ গাজালি। তাঁর রচিত *মিন হুনা নবদাউ* গ্রন্থে। এ ছাড়া আরও অনেকে তাঁর কথার জবাব দিয়েছেন।

আবু বকর (রা.)-এর যুগকে অবজ্ঞা করে। তাঁর যুগকে মনে করে গুরুত্বহীন। এমনকি তাঁর অবদানকে পর্যন্ত অস্বীকার করার চেষ্টা করে; অথচ আবু বকর (রা.)-এর যুগে অল্প সময়ে অনেক বড়ো বড়ো কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি ধর্মত্যাগী ও জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। তিনিই সংরক্ষণ করেছেন গরিবদের অধিকার এবং তিনিই সর্বপ্রথম গরিবদের অধিকার সংরক্ষণে যুদ্ধ করেছেন। এ নিয়ে তাঁর একটি ঐতিহাসিক বক্তব্যও রয়েছে। তা এই—

> 'তারা (জাকাত অস্বীকারকারীরা) যদি এমন একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে—যা তারা ইতঃপূর্বে রাসূল (সা.)-এর যুগে আদায় করত, তাহলে আমি প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।'[৩]

তাঁর যুগেই রোম-পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলামি রাষ্ট্রের বিজয়ের সূচনা হয়। তৎকালীন পরাশক্তি পারস্যের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চলা অবস্থায় পরপারের উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেন।

তিনিই কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমরনীতি বা যুদ্ধের কলাকৌশল আবিষ্কার করেন। তাঁর আদেশ ছিল—

> 'যুদ্ধের ময়দানে যেন কোনো পাদরি বা ধর্মীয় ব্যক্তিকে হত্যা করা না হয় এবং একই সাথে কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম।'[৪]

কোনো শত্রুর মাথা কেটে আনাও তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন—

> 'কোনো শত্রুর মাথা কেটে যেন আমার সামনে না আনা হয়।'[৫]

তিনিই সর্বপ্রথম সাংবিধানিক রীতি প্রণয়ন করেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম খুতবায় তিনি বলেন—

'হে লোকসকল! আমাকে তোমাদের শাসক মনোনীত করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। যদি তোমরা দেখো আমি হকের ওপর আছি, তাহলে আমাকে সহযোগিতা করবে। আর যদি দেখো ভুলের ওপর আছি, তাহলে আমাকে শোধরে দেবে। আমি যতক্ষণ আল্লাহর আনুগত্য করব, তোমরাও আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই, তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করবে না।'[৬]

---

[৩] বুখারি : ৭২৮৪; মুসলিম : ২০

[৪] *মুয়াত্তায়ে মালেক* : ১৬২৭; *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক* : ৫/২০০; *কিতাবুস সিয়ার* : ৯/১৪৫

[৫] নাসায়ি : ৮৬২০; *সুনানু সাইদ ইবনে মানসুর* : ২৬৪৯, বায়হাকি : ৮/ ২২৩; *আল বাদরুল মুনির* : ৯/১০৭; *আত-তালখিসুল হাবির* : ৪/২৮৭

[৬] *সিরাতে ইবনে হিশাম* : ৬/৮২, *আল বিদায় ওয়ান নিহায়া* : ৪/৪১৬

শরিয়াহই ছিল ইসলামি সমাজের মূল চালিকাশক্তি

এখানে একটি বিষয় আরও স্পষ্ট করা প্রয়োজন মনে করি। ইতিহাস প্রমাণ করে এবং সাক্ষ্য দেয়, শরিয়াহই ছিল ইসলামি সমাজের মূল চালিকাশক্তি। নবিযুগ থেকে শুরু করে উসমানি শাসনামল পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর শরিয়াহই ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক আইনের মূল উৎস। এমনকি ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশে আধিপত্য বিস্তারের আগপর্যন্ত শরিয়াহ আইনই সাংবিধানিক আইনের মূল ও প্রধান উৎস হিসেবে বলবৎ ছিল।

ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশে আধিপত্য শুরু করলে সমাজে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। তারা শরিয়াহকে আইনের মূল ভিত থেকে উপড়ে ফেলে এবং মুসলমানদের আত্মপরিচয় ও তার প্রকৃতি পরিবর্তনের চেষ্টায় রত হয়—যাতে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা তাদের জন্য সহজ হয়।

ঔপনিবেশিক আমলের আগে দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামি শরিয়াহই ছিল মুসলমানদের আইনের মূল উৎস। সমাজের বিচারব্যবস্থা, ফতোয়া, শিক্ষাদীক্ষা ও অন্যান্য দিকনির্দেশনারও প্রধান উৎস ছিল এই শরিয়াহই। এ সময় সমাজে শরিয়াহ আইনের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।

পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদরা এ কথার সাক্ষ্য দেয়—নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মাঝে ফাটল সৃষ্টি আর প্রায়োগিক ও আচরণগত বিষয়ের মাঝে ফাটল সৃষ্টি এক বিষয় নয়। তবে এ কথা অবশ্যই সত্য, অন্য ধর্মের মানুষের চাইতে মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ বেশ শক্তিশালী ও দৃঢ়।

অতীতে মুসলিম দেশে বাসকারী শাসক-শাসিত সব মুসলমানই ছিলেন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ও রক্ষণশীল। কারণ, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা এবং তা মেনে চলা তাদের ঈমানের অংশ এবং এটাই ঈমানের একান্ত দাবি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا-

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।’[৭]

[৭] সূরা আহজাব : ৩৩

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'মুমিনদের যখন ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে—"আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।" আর তারাই তো সফলকাম।'[৮]

অতীতে ইবাদত-বন্দেগি, আচার-ব্যবহার ও চালচলনে মুসলমানরা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলত। তারা বিয়ে-শাদি, তালাক, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টন, বেচাকেনা, ভাড়া দেওয়া-নেওয়া ইত্যাদির সবকিছুই করত ইসলামি বিধান অনুসারে। এমনকি কোনো শিশু জন্মালে কিংবা কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার সাথে শরিয়াহ নির্দেশিত আচরণই করা হতো।

কখনো হালাল-হারামের কোনো বিষয় তাদের কাছে জটিল বা অস্পষ্ট মনে হলে তারা দ্রুত আলিমদের নিকট ছুটে যেত। আলিমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে তার সমাধান বের করে দিতেন। আর সে অনুযায়ীই লোকজন আমল করত।

নিজ এলাকায় কিংবা সফরে, নির্জনে বা জনসমাগমে, রাত কিবা দিন—সব সময় তারা ইসলামি বিধান মেনে চলত। বলা যায়, এ সময় তাদের জীবন ছিল শরিয়াহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এ হলো শরিয়াকে আঁকড়ে ধরার বর্ণনা। আর শরিয়াহকে বাস্তবায়নের দিক থেকে আমরা তাদের মাঝে ভিন্নতা দেখতে পাই। যে ভিন্নতার বর্ণনা দিয়ে আল কুরআন ঘোষণা করেছে—

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللهِ-

'অতঃপর তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মিতাচারী, আর কেউ আল্লাহর নির্দেশে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী।'[৯]

এদের প্রত্যেকেই আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। এমনই জালিম-অত্যাচারীও। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ-

'অতঃপর আমি এ কিতাবের অধিকারী করেছি তাদের, যাদের আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। অতঃপর তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী।'[১০]

পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত মুসলমান তাদের জীবনের যেকোনো সমস্যার সমাধানে শরিয়াহর দ্বারস্থ হতো। তাদের বিচারকার্য পরিচালনা করত শরিয়াহ মোতাবেক। সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শরিয়াই ছিল সব ইসলামি রাষ্ট্রে স্বীকৃত ও আমলযোগ্য একক বিধান।

---

[৮] সূরা নুর : ৫১
[৯] সূরা ফাতির : ৩২
[১০] সূরা ফাতির : ৩২

ইসলামি রাষ্ট্রে ফতোয়া একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি আঞ্জাম দিয়ে থাকেন উম্মাহর আলিমগণ। কোনো বিষয় জায়েজ নাকি নাজায়েজ, তা জানার জন্য মানুষ স্বেচ্ছায় আলিমদের শরণাপন্ন হয়। অতীতকাল থেকেই মানুষ এক্ষেত্রে আলিমদের ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে আসছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

সত্যিকার ও প্রকৃত ইতিহাস আমাদের ইসলামি সভ্যতার বিভিন্ন আলোকিত ও সোনালি যুগের সংবাদ দেয়। যে যুগে মুসলিম শাসকরা ছিল দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক। দ্বীনের জন্য তারা নিজেদের কুরবান করে দিয়েছিলেন। তারা ছিলেন দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এবং তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছিলেন। পৃথিবী শাসন করেছিলেন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী। আর পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ন্যায় ও ইনসাফ। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার মাঝে শরয়ি দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করেছিলেন। শরিয়াহর বিধান বাস্তবায়নে তারা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় পেতেন না। পরোয়া করতেন না কোনো সমালোচকের সমালোচনারও। ফলে তারা হয়েছিলেন সম্মানিত।

আর পেয়েছিলেন সফলতার নাগাল। তাদের বদৌলতে এই উম্মাহও সম্মান, সফলতা ও বিজয়ের ছোঁয়া পেয়েছিল।

দ্বীন ও শরিয়াহর প্রতি সুলতানদের যত্নবান ও রক্ষণশীল হওয়াটাই মূলত ইসলামি আইন ও অনুশাসনের স্থায়িত্বের প্রমাণ। নিঃসন্দেহে এই শরিয়াহর অনুসরণ এবং তাকে আঁকড়ে ধরার মাঝে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। আর এই শরিয়াহ ভিন্ন অন্য কোনো পথ বা পন্থা অনুসরণে রয়েছে স্পষ্ট ভ্রষ্টতা ও নিশ্চিত ধ্বংস।

উমাইয়া যুগের শাসকদের ন্যায় প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথম যার নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.)। অন্যদিকে সর্বাধিক জালিম ও অত্যাচারী ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। সেও ছিল উমাইয়া শাসক। তার শাসনামলে জুলুম ও নির্যাতনের মাত্রা এত বেশি ছিল, যা ছিল পারস্য ও রোম সম্রাট কিসরা-কায়সারের কাছাকাছি। তার এ অত্যাচার ও স্বৈরাচারী মনোভাবের কারণে ইসলামি শাসন খিলাফতে রাশেদার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে উমর ইবনে আবদুল আজিজের ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসনে পুনরায় তা খিলাফতে রাশেদা রূপ পরিগ্রহ করে।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে শরিয়াহর বিধান বাস্তবায়ন শুরু করেন। নিষিদ্ধ করেন সমস্ত বিলাসিতা। জালিমকে জুলুম থেকে প্রতিহত করেন। ফিরিয়ে দেন মজলুমের অধিকার। নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা নিষিদ্ধ করেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। নামাজ আদায় ও জাকাত প্রদানের বাধ্যবাধকতাকে আরও জোরালো করেন। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন।

ইতিহাসের কৃতিত্ব

যারাই অনুধাবনের নিয়তে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমাদের ইতিহাস পড়েছে, উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত এ নির্মল ইতিহাসের সম্ভারে চাপা পড়া পঙ্কিলতাকে অধ্যয়ন করেছে উদারভাবে, এ ইতিহাস পড়ার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে একটা এক্সট্রা চাপ প্রয়োগ করেছে এবং আমাদের যারা চিন্তা-চেতনায় প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত, তারা দেখেছে—মানবেতিহাসের অন্য ইতিহাসগুলোর মতোই আমাদের ইতিহাসও ভুলে ভরা। তবে আমাদের ইতিহাসকে তারা সভ্য জাতির ইতিহাস নামে আলাদাভাবে বিশেষায়িত করেছে। যেহেতু এ ইতিহাসের আছে কৃতিত্ব, সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু অন্য জাতির ও সভ্যতার ইতিহাসে আমাদের মতো কৃতিত্ব নেই।

বর্তমানে এসব কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্য—যাতে পাঠক সংকীর্ণমনা গোঁড়া ইতিহাসবিদদের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত হয়ে এ ইতিহাসের বাস্তবতা জানতে পারে। আমরাও এ ইতিহাসের ব্যাপারে ন্যায়সংগত রায় দিতে পারি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের ন্যায়সংগত রায় প্রদান করাই শিখিয়েছেন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى-

‘যখনই তোমরা কোনো ব্যাপারে কথা বলবে, তখন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। যদিও তা (তোমাদের একান্ত) আপনজনের (বিরুদ্ধেও) হয়।’[১১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

‘কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে, (এর ফলে) তোমরা (তাদের সাথে) ন্যায় ও ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো। কারণ, এ কাজটি (আল্লাহকে) ভয় করে চলার অধিক নিকটতর। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।’[১২]

[১১] সূরা আনয়াম : ১৫২
[১২] সূরা মায়েদা : ৮

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ- وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ-

'তোমরা ওজনে সীমালঙ্ঘন করো না। আর তোমরা ন্যায়সংগতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠা করো। ওজনকৃত বস্তু কম দিয়ো না।'[১৩]

সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ নির্দেশিত এ পন্থাই হলো সঠিক কর্মপদ্ধতি। যাতে থাকবে না কোনো অতিরঞ্জন, থাকবে না কোনো হ্রাসকরণ। আমরা এখানে আমাদের ইতিহাসের কিছু কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো হচ্ছে—

- গভীর ধার্মিকতার ছোঁয়া
- মানবতা ও মনুষ্যত্ব
- চারিত্রিক উৎকর্ষতা
- ধর্মীয় উদারতা
- শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম
- বড়ো বড়ো বিপদ মোকাবিলা করার সক্ষমতা।

গভীর ধার্মিকতার ছোঁয়া

যারা আমাদের সভ্যতার ইতিহাস লিখেছেন, তারা প্রত্যেকেই জানেন, প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস থেকে আমাদের সভ্যতার ইতিহাস একটু ভিন্ন। আমাদের সভ্যতা সর্বদিক থেকে রব্বানিয়া-এর গুণে গুণান্বিত। এখানে বাহ্যিক দিকের পাশাপাশি আত্মিক বিষয়টিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

রব্বানিয়ার অর্থ হলো—আমাদের ইতিহাসের সূচনা আল্লাহ থেকে। আবার তা শেষও হয় আল্লাহতে গিয়ে।

অতএব, যে জাতি এ ইতিহাসের সূচনা করেছে, এ সভ্যতা তৈরি করেছে, তারা সৃষ্টিগতভাবেই একটি সভ্য জাতি। বনাঞ্চল বা মরুভূমির পরিত্যক্ত গাছের মতো তারা সৃষ্ট হয়নি। অর্থাৎ যে গাছের রোপণকারী নেই, নেই পরিচর্যাকারী; বরং এ জাতি হলো এমন এক জাতি, যাদের আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ নিজে যাদের পরিচর্যা করেছেন। তাদের সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। আর তাদের মধ্যপন্থি জাতি বানিয়েছেন। যেমন : আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-

---

[১৩] সূরা আর-রহমান : ৮-৯

‘আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যপন্থি জাতি বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর।’[১৪]

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

‘তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমণ্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে। অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে।’[১৫]

এ জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ওহির ঐশী জ্ঞান শেখানোর জন্য। যে জ্ঞান আল্লাহর কিতাব কুরআন ও নবি মুহাম্মাদের সুন্নাহ থেকে সংগৃহীত হবে। যে নবির ওপর আল্লাহ কুরআন নাজিল করেছেন, যাতে তিনি তা মানুষের মাঝে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। উপমা দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দেন। কার্যে পরিণত করে তা মানুষকে দেখিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ-

‘আর তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে।’[১৬]

অন্যভাবে বলা যায়, মানুষকে শুধু আল্লাহর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে—যাতে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে। আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকে।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের লক্ষ্য হবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাঁর দেওয়া পুরস্কার পেয়ে সফল হওয়া। যেমন : আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- لَا شَرِيْكَ لَه وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ-

‘বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য। তার কোনো অংশীদার নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী।’[১৭]

---

[১৪] সূরা বাকারা : ১৪৩
[১৫] সূরা আলে ইমরান : ১১০
[১৬] সূরা নাহল : ৪৪
[১৭] সূরা আনয়াম : ১৬২-১৬৩